বাংলার অক্সফোর্ড

শৈলেন্দ্রনাথ কাবাসী

আঠারো শতকের শেষের নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। এই স্বাধীনচেতা উন্নত চরিত্রের মানুষটি রাজানুগ্রাহী অভিজাত জ্ঞানীগুণীদের কাছে ব্রাত্য ছিলেন। রামনাথ তাই হয়ে যান 'বুনো'। 'বুনো' হল কেন, দুটি মত প্রচলিত। প্রথমত, পার্থিব ঔদাসীন্যহেতু তাঁর বাসগৃহ আগাছায় ভরা ও জঙ্গলময় হয়ে উঠেছিল। তাই সভ্যভব্য লোকের কাছে তিনি 'বুনো'। দ্বিতীয়ত, তিনি নিজস্ব 'গ্রাম্যতা' ত্যাগ করতে পারেননি। প্রোটোকলের ধার ধারতেন না। তাই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদদের মতে তিনি ছিলেন, গেঁয়ো তথা 'বুনো'। 'বুনো' শব্দটির ন্যায়ের লোকশাস্ত্র প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তগুলি অভিধানে—অজাকৃপানীন্যায়, অন্ধগজ (হস্তী) ন্যায়, অন্ধ গো (বৃষ) লাঙ্গুলন্যায়, অর্ধকুক্কুটীন্যায়, অশ্বতরীগর্ভন্যায়, অহিনকুলন্যায়, উষ্ট্রকন্টকভক্ষান্যায়, আরণ্যরোদনন্যায়, কাকতালীয়ন্যায়, কাকদন্তপরীক্ষা (বিচার) ন্যায়, কূপমণ্ডূকন্যায়, কূর্মাঙ্গন্যায়, খলকপোতন্যায়, গড্ডলিকাপ্রবাহন্যায়, গোবলীবর্দন্যায়, তৃণজলৌকান্যায় (ছিনে জোঁক), নষ্টশ্বদগ্ধরথন্যায়, বিষবৃক্ষন্যায়, বিষকৃমিন্যায়, বীচিতরঙ্গন্যায়, বীজাঙ্কুরন্যায়, মণ্ডূকপ্লুতিন্যায়, শাখাচন্দ্রন্যায়, শ্যেনকপোতন্যায়, সিংহাবলোকনন্যায় ইত্যাদি। ন্যায়শাস্ত্রের এই দৃষ্টান্তগুলি আদিম পশুপক্ষী—অরণ্যশ্বাপদ-লতাগুল্মময়। অর্থাৎ 'বুনো'। ন্যায়শাস্ত্রবিদ তথা নৈয়ায়িক রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মনে হয় কথায় কথায় এই ধরনের 'বুনো' উদাহরণ পেশ করতেন ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করতেন। তর্কপ্রিয় বাঙালি পরাজিত হতে ভালোবাসে না কোনও কালে। হেরে গেলে বিজয়ীকে সম্মান না দিয়ে—পরিবর্তে নানা রকম শ্লেষাত্মক মন্তব্য করে। 'বুনো' রামনাথ তাঁর 'বুনো' উপাধিটি সম্ভবত পেয়েছিলেন তাঁর 'হেরো' প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে।

পঞ্চদশ শতকের আগে পর্যন্ত প্রায় তিনশো বছর ধরে ভারতে শাস্ত্রচর্চা ও অধ্যয়ন ক্ষেত্রে মিথিলা বিদ্যালয়ের আধিপত্য ছিল অবিসংবাদিত। সারা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালাভ ও

স্বীকৃতির জন্যে দলে দলে মিথিলা গমন করত। জানা যায়, আধিপত্য কায়েম রাখার জন্য মিথিলার পণ্ডিতেরা কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের পুঁথি বহিরাগত ছাত্রদের নকল করতে দিতেন না।

এই শাস্ত্রচর্চার মধ্যে ন্যায় অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রেরই (Logic) প্রাধান্য ছিল। মিথিলার প্রখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রাচীন ন্যায়ের রূপান্তর ঘটিয়ে নব্য ন্যায়ের সূচনা করেছিলেন। বিদ্যাচর্চায় মিথিলার একাধিপত্য পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের জয়দেব (পক্ষধর) মিশ্র পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। নবদ্বীপে অসামান্য মেধাশক্তির রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়ের কূট তর্কে পক্ষধরকে পরাস্ত করে মিথিলার গর্ব খর্ব করেন।

কথিত, রঘুনাথ মিথিলার তাবৎ শাস্ত্রগ্রন্থ স্মৃতিধার্য করে বয়ে এনেছিলেন নবদ্বীপে। এই লোকশ্রুতি, রঘুনাথের শিক্ষাগুরু বাসুদেব সার্বভৌম সম্পর্কেও প্রচারিত আছে। পক্ষধরকে হারিয়ে রঘুনাথ ভারতসেরা নৈয়ায়িক হয়ে উঠেছিলেন। নবদ্বীপে তাঁর টোলে সারা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আসতে শুরু করেছিল। রঘুনাথ গঙ্গেশ্বর 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থকে এত নিগূঢ় যুক্তিজালে সমৃদ্ধ করেছিলেন, তাতে নব্যন্যায় যেন পুনরায় নতুন হয়ে উঠেছিল।

অষ্টাদশ শতকে ভারতে ব্রিটিশরাজ কায়েম হওয়ার সময়ে নবদ্বীপ ছিল প্রকৃত অর্থেই 'ভারতীয় রাজধানী। নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, তন্ত্রশাস্ত্র, কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্ববিদ্যার চর্চাকেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। ইংরেজ বিদ্যাবানদের চোখে এই জনপদ ছিল—"অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল।"

নবদ্বীপের এই বিদ্যা-গৌরব রঘুনাথ শিরোমণির সময় থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও তার সূচনা ও বিকাশকাল বহু আগে। পাল রাজত্বের শেষ দিকে ব্রাহ্মণ্য বিদ্যাচর্চাকেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। লক্ষণসেনের নবদ্বীপের রাজসভা অলংকৃত করে থাকতেন জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি ধর, হলায়ুধ, শরণ প্রমুখ কবি এবং পণ্ডিতেরা।

১৮২১ সালের এক সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়— খড় বা তালপাতায় ছাওয়া একটি শ্রেণিকক্ষ সহ দু-তিন সারি মাটির ঘুপচি ঘর। ঘরগুলো শিক্ষার্থীদের আবাসগৃহ। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে পণ্ডিতের সেখানে আগমন ঘটে এবং গভীর অভিনিবেশে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শিক্ষা দান চলে।

কুটিরগুলি নির্মাণ ও মেরামতির দায়িত্ব পণ্ডিত বা অধ্যাপকের। ছাত্রদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থাও তিনিই করেন। এজন্যে নদিয়ার রাজন্যবর্গ এবং আশেপাশের জমিদারদের কাছ থেকে তিনি সাহায্য পেয়ে থাকেন।

এক-একটি টোলে ছাত্রসংখ্যা কুড়ি থেকে পঁচিশ। তবে অতি বিখ্যাত অধ্যাপকের ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশ-ষাটও হয়ে যায়। সকল টোল মিলিয়ে (নবদ্বীপে) ছাত্রসংখ্যা পাঁচ-ছ'শো। বেশির ভাগই বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা। বহিরাগতদের বেশিটা আসে দাক্ষিণাত্য থেকে, কিছু নেপাল এবং আসাম থেকে আর আসে মিথিলা থেকে। (এইচ. এইচ. উইলসন ও উইলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্ট)

১৮৬৭ সালের রিপোর্টে-টোলগুলি মাটির তৈরি চতুষ্কোণ ঘুপচি ঘর। প্রতিটি ছাত্রের জন্য রয়েছে আলাদা কুটির এবং তারা সেখানে অতি প্রাচীন প্রণালীতে বসবাস করে। কুটিরে জিনিসপত্র বলতে জল, খাবার বাটি এবং শোওয়ার জন্যে মাদুর। কারও ঘরে সামান্য আসবাব। প্রত্যেক ছাত্রকে স্মৃতি এবং ন্যায় শিক্ষার জন্যে আট এবং দশ বছর টোলে কাটাতে হত। (ই. বি. কাওয়েল, গ্যারেটের বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজিটিয়ার, নদিয়া)

১৬৮০ সালে নবদ্বীপের টোলের ছাত্র ছিল চার হাজার, অধ্যাপক ছ'শো। ১৭৯১-তে এই সংখ্যা এগারো শো, দেড়শো। ১৮১৬-সালে ছেচল্লিশটি টোলে তিনশো আশিজন ছাত্র ছিল। ১৮২৯-এ পঁচিশটি টোলে প্রায় পাঁচ-ছ'শো ছাত্র ছিল।

নদিয়ার রাজাদের দান করা জমি থেকে টোলের খরচ চালানোর যে ব্যবস্থা ছিল, ১৭৮৪-তে সেই জমি ইংরেজ সরকার অধিগ্রহণ করে নিয়মিত কিছু বৃত্তি দিতে শুরু করে। ১৮২৯ সালে আইনি অজুহাতে তা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বহিরাগত ছাত্রদের জন্য মাসিক দু'শো বৃত্তি ধার্য হয়। ১৮৯৯ সালে এই পরিমাণ বেড়ে তিনশো টাকা হয়। এই সময় কলকাতায় 'বোর্ড অফ সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়। তার মধ্যে অধ্যাপকদের বৃত্তি প্রদান ও খ্যাতনামা অধ্যাপকদের 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দান উল্লেখযোগ্য।

ক্রিশ্চান মিশনারি এডাম ১৮৩৫-৩৮ সালের মধ্যে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিস্তৃত প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন তা থেকে জানা যায় যারা বাংলায় অন্তত ১৮০০ টি টোলে ১২৬০০ জন অধ্যাপক শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বাঙালীর সারস্বত অবদান' নামক বইটিতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বঙ্গদেশে যে সকল অধ্যাপক টোলে নব্যন্যায়ের চর্চা করছেন, একমাত্র তাঁদের সংখ্যাই পঞ্চাশ হাজারের বেশি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থের শিক্ষা সমস্যা প্রবন্ধে বলেছেন—'এই টোলের প্রতি লক্ষ করিলেও দেখা যাইবে, চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সবচেয়ে বড় জিনিস নয়, সেখানে চারিদিকেই অধ্যয়ন অধ্যাপনার হাওয়া বইতেছে। গুরু নিজেও ঐ পড়া লইয়াই আছেন। শুধু তাই নয়, সেখানে জীবন যাত্রা নিতান্ত সাদাসিধা, বৈষয়িকতা বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়।' মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন এই টোলশিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নয়নমুখী করতে নানা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। মহেশচন্দ্রের পিতৃব্য ঠাকুরদাস চূড়ামণির হাতিবাগানে টোল ছিল। মহেশচন্দ্র নিজে কলেজশিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও গভীরতার অভাব লক্ষ করেই টোলের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন,কলেজশিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষার উন্নতি হয় না। তাই তিনি চেয়েছিলেন টোলের শিক্ষা এক স্বতন্ত্র পথে চলুক। টোলে যেভাবে শিক্ষাদান করা হয়, শুধুমাত্র সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে সেই শিক্ষাদান প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবনকালে

এই টোলসমূহকে সাহায্য দেবার প্রস্তাব করে ১৮৭৮ সালে ১৫ আগস্ট শিক্ষা অধিকর্তা ক্রাফট্‌কে মহেশচন্দ্র এক পত্র লিখলেন—'টোল বা প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষায়তনসমূহ সেকালে বহু সৎকার্য্য করিয়াছে। উহা সংস্কৃত বিদ্যার দীপশিখা এদেশে প্রোজ্জ্বল রাখিয়াছে। চতুষ্পাঠী শিক্ষার পদ্ধতি প্রাণ শক্তিতে অটুট,আগামী বহুকাল এই ধারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বহমান থাকিবে।'

মহেশচন্দ্র ১৮৯১ সালে বাংলা বিহার ওড়িশার টোলগুলি পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহের পর তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা ক্রাফট্ সাহেবের কাছে এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও কয়েকটি জরুরী প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত নিয়মগুলি টোলশিক্ষার ক্ষেত্রে আজও অনুসৃত হয়ে আসছে। তাঁরই উদ্যোগে চতুষ্পাঠী উন্নয়নের জন্য ১৮৭২ সালে 'বেঙ্গল সংস্কৃত আসোসিয়েশন' গড়ে ওঠে। যাদের দায়িত্ব ছিল চতুষ্পাঠী শিক্ষার উন্নয়ন এবং প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া। ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্যন্ত এই অনন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার টোল শিক্ষার আরও উন্নতির জন্য ১৯৪৯ সালের ৪ মে 'বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ' গঠন করেন এবং একটি সংবিধানও রচিত হয়। এই সংবিধান অনুসারে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ টোলপণ্ডিতদের দ্বারা নির্বাচিত একটি স্বশাসিত পর্ষদ হিসাবে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কাজ করেছিল।

নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন, তন্ত্রাচার্য আগমবাগীশের পদাঙ্ক অনুসারী ভারতখ্যাত তীক্ষ্ণধী পণ্ডিতদের নিবাসস্থল নবদ্বীপে। অথচ পাণিনির ব্যাকরণের মতোই রঘুনাথের ন্যায়শাস্ত্র এখন বিশ্বে বিশেষ চর্চিত বিষয়। নবদ্বীপে ন্যায়ের শিক্ষকই বিরল।

অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল অভিধায় পরিচিত নবদ্বীপে সরকারি সংস্কৃত কলেজটিরও কোনও সংরক্ষণ হয়নি, জোটেনি সামান্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও। কলেজবিল্ডিংয়ের অবস্থা জরাজীর্ণ। ঘরদোর আগাছায় ভরা, কোথাও বা ভেঙে পড়েছে ছাদ। অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের অবসর গ্রহণের পর দশ বছর হল কোন নতুন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ নিয়োগ করেনি সরকার। তাই পঠন-পাঠন বন্ধ। এরই মধ্যে কলেজের কিছু অংশে সরকারের সহায়তায় প্রোমোটারির থাবা পড়েছে। শতবর্ষ আগের প্রখ্যাত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থের অনবদ্য আবক্ষ মূর্তির নাকটি ঘষে ভেঙে দিয়েছে কেউ।

আঠারো শতক পর্যন্ত গুরুকুল প্রথায় দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির ধারা অব্যাহত ছিল। এদেশে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারি কাজে ফারসির প্রচলন থাকলেও দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার গরিমা অটুট ছিল। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপ এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের অত্যুৎসাহে শিক্ষার দেশীয় ব্যবস্থা তথা সংস্কৃত চর্চা কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

ভারতী চতুষ্পাঠী আবাসিক টোল। প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাজেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। টোল টিকিয়ে রাখার জন্যে ভারতী চতুষ্পাঠী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় নামে একটি আস্ত কলেজ গড়ে ফেলেন। এখন সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান দ্বারা অনুমোদিত। সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে সরকারের উদাসীনতায় হতাশ বিদ্যাসাগর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সংস্কৃত

অধ্যাপক অরূপকুমার চক্রবর্তী, সতী দেবভাষা শিক্ষা নিকেতনে টোলের পাশাপাশি যজুঃ ও সাম বেদের শিক্ষাদান চলছে কয়েক বছর ধরে। উজ্জয়িনীর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত, ছয় বছরের পাঠ্যক্রম উচ্চমাধ্যমিক সমতুল্য। নবদ্বীপে জ্ঞানচর্চার মধ্যযুগীয় প্রবল ধারাটি সময়ের বিচিত্র প্রহারে আজ লুপ্ত। সংস্কৃত পঠন পাঠনের আঁচও নিভু নিভু। ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের অগণিত ঋষিপ্রতিম মনীষার অধীত জ্ঞানভাণ্ডার সমাহিত রয়েছে এই প্রাচীন ভাষার অন্তরে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত দেশে ১৩ টি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সম্প্রতি ভারতের সংবিধান সংস্কৃতে মুদ্রিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান সাধারণের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ২০ টি সিডি প্রকাশ করেছে। ❑

তথ্যঋণ : ১. একদিন, ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৯
২. দৈনিক স্টেটসম্যান, ২৯ আগস্ট ২০১০
৩. আজকাল, ১২ ডিসেম্বর ২০১০